অনন্যতায় একাত্মতা

এই শিখন অভিজ্ঞতায় আমরা নিজ ও সহপাঠীর আত্মপরিচয় নির্ণয় করব। পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আত্মপরিচয় কীভাবে গড়ে ওঠে তা দেখব। আমাদের এই আত্মপরিচয় গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে নিজেদের অনন্যতা ও বৈচিত্র্য খুঁজব।

আমার আত্মপরিচয়

চলো, এখন আমাদের মতো একটি বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির কয়েকজন শিক্ষার্থীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান ক্লাসের একটি ঘটনা সম্পর্কে জানি।

অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক লেগেই থাকে। সেদিন তর্ক শুরু হলো, পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের বাস, তারা কেউ কারো মতো নয়। কেউ একজন বলছিল যে, একটি অঞ্চলের মানুষ একেক রকম, কিন্তু একটি অঞ্চলের মানুষের মধ্যে বেশ মিল থাকে, তাঁদের মধ্যে কিছু মানুষ তো একই রকম হতেই পারে। ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞানের পরবর্তী ক্লাসে শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করতেই ওই দিনের তর্কের সূত্র ধরে আবেদ জানতে চাইল যে, পৃথিবীতে যত মানুষ বাস করে তাঁদের মধ্যে কিছু মানুষ একরকমের হতে পারে কিনা। ওর প্রশ্ন শুনে শিক্ষক একটুখানি ভাবলেন। তিনি সকলকে উদ্দেশ্য করে এই বিষয়ে মতামত জানতে চাইলেন। দেখা গেল ওরা দুই রকমের কথাই বলছে। একদল বলছে যে মিল থাকলেও কখনো পুরোপুরি একরকমের হয় না। অন্য দল বলছে মাঝে মাঝে হুবহু একইরকমের হতেও পারে। ওদের প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে শিক্ষক সকলকে একটি কাজ করতে বললেন। তিনি আরও বললেন যে, এই কাজের মাধ্যমে ওদের প্রশ্নের উত্তর ওরাই খুঁজে বের করতে পারবে।

শিক্ষক প্রথমে আত্মপরিচয় কী তা নিয়ে ভাবতে বললেন। তারপর তাঁদের আত্মপরিচয়ের মিল ও অমিল খুঁজতে বললেন। এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইলেন, আত্মপরিচয়ের কোন কোন বিষয়ে তোমাদের মিল আছে আর কোন কোন বিষয়ে রয়েছে অমিল। ক্লাসের সবাই ভীষণ উৎসাহ নিয়ে মিল ও অমিল বলল। এই মিল ও অমিল থেকে তারা নিজেদের অনন্যতা ও বৈচিত্র্য খুঁজে পেলো।

আচ্ছা আমাদের কী এরকম একটি কাজ করতে ইচ্ছে করছে না? আমরাও তো পারি নিজেদের অনন্যতা ও বৈচিত্র্য খুঁজে বের করতে। তাহলে আমরাও আমাদের আত্মপরিচয় নির্ণয় করি। এজন্য আমরা নিচের চিত্রটির মতো করে একটি চিত্র খাতায় এঁকে নিজের আত্মপরিচয় সম্পর্কে লিখি।

অনুশীলনী ১: **আমার আত্মপরিচয় লিখি**

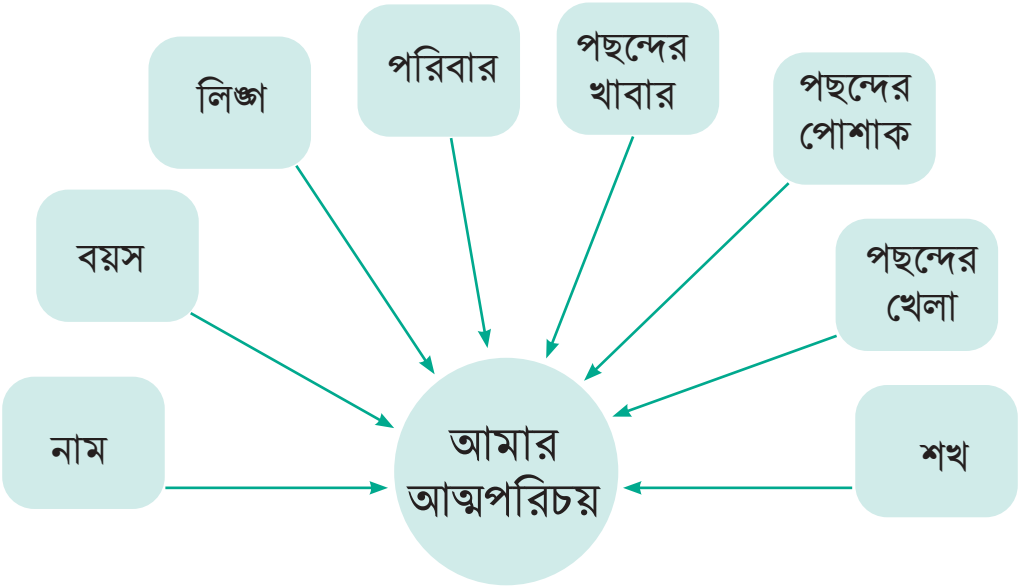

দলগত কাজ ১:

এখন আমরা নিজেদের আত্মপরিচয়ের সঙ্গে সহপাঠীর আত্মপরিচয়ের মিল ও অমিল খুঁজব। এই কাজটি আমরা দলগতভাবে করব। আমরা দলে বসে নিজের ও সহপাঠীর আত্মপরিচয় নিয়ে আলোচনা করে মিল ও অমিলের একটি তালিকা করব। আমরা নিচের ছকটির মতো একটি ছক খাতায় লিখে এই তালিকা করব।

অনুশীলনী ২: **আমার ও সহপাঠীর আত্মপরিচয়ের মিল ও অমিল খুঁজি**

সহপাঠীর নাম	আমার আত্মপরিচয়ের সঙ্গে যা যা মিলে যায়	আমার আত্মপরিচয়ের সঙ্গে যা যা মিলে যায়নি

আমরা সহপাঠীর সঙ্গে নিজের আত্মপরিচয়ের বেশ কিছু মিল ও অমিল খুঁজে পেয়েছি, তাই না? আমরা এখন প্রতিটি দল থেকে ১ বা ২ দুজনের কাছ থেকে তালিকা শুনে নিই। আমরা খেয়াল করে শুনলে বুঝতে পারব

আমাদের ক্লাসের সব বন্ধুদের আত্মপরিচয়ের কিছু মিল ও অমিল আছে। এভাবে আমাদের সমাজের প্রতিটি মানুষের আত্মপরিচয়ে মিল ও অমিল আছে। এভাবেই আমরা হয়ে উঠি বৈচিত্র্যময় ও অনন্য।

পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠা আমার আত্মপরিচয়

এখন আমরা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য নিয়ে আমাদের পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি ও ভৌগোলিক পরিচয় সম্পর্কে জানব। তথ্য সংগ্রহের জন্য এখন আমাদের কী করতে হবে? ঠিক ভেবেছ, আমাদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অনুসন্ধান করতে হবে। অনুসন্ধানী কাজের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের আগে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখি। উত্তরগুলো লিখে ফেললে অনুসন্ধানী কাজটি করা অনেক সহজ হয়ে যাবে।

ছক: অনুসন্ধানী কাজে তথ্য সংগ্রহের আগে করণীয়

প্রশ্ন	উত্তর
আমার অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু কী?	
আমার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য কী?	
আমার অনুসন্ধানের হাইপোথিসিস (যদি থাকে)?	
আমার অনুসন্ধানের তথ্যের উৎস কারা?	
আমার অনুসন্ধানের তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি কোনটি?	
আমার অনুসন্ধানের জন্য কত সময় ও বাজেট প্রয়োজন?	
আমার অনুসন্ধানের জন্য তথ্য সংগ্রহের সময় অনুমতি নিয়েছি কি?	

আমরা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য নিতে পারি। এজন্য আমাদের একটি প্রশ্নমালা তৈরি করতে হবে। প্রশ্নমালাটি আমাদের পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিচয় বিষয়ক প্রশ্ন দিয়ে সাজাব। নিচে তথ্য সংগ্রহের জন্য কিছু বিষয় দেওয়া হল। এই বিষয় অনুসারে আমরা কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করব।

আমার পরিবার

- **পূর্বপুরুষের নাম**
- **পূর্বপুরুষের আবাসস্থল**
- **বর্তমান ঠিকানা**
- **বংশ/গোত্র/সম্প্রদায়**
- **ভাষা**
- **ধর্ম**
- **প্রথা**
- **রীতি-নীতি**
- **উৎসব উদযাপন**
- **ভৌগোলিক অবস্থান**

তথ্য সংগ্রহের বিষয়

প্রশ্ন তৈরির কাজ হয়ে গেলে আমরা পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করব। তথ্য সংগ্রহের পর আমরা এখন কী করব? একদম ঠিক ভাবছ, আমরা তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল নির্ণয় করব। প্রাপ্ত ফলাফল থেকে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিব।

সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আমরা যে তথ্য পেলাম তা বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত ফলাফল থেকে আমরা নিচের ছকটি পূরণ করব।

অনুশীলনী ৩: আমার পারিবারিক পরিচয়

অভিভাবক:	
পূর্বপুরুষের নাম	
পূর্বপুরুষের আবাসস্থল	
বর্তমান ঠিকানা	
বংশ/গোত্র/সম্প্রদায়	

ভাষা	
ধর্ম	
প্রথা	
রীতি-নীতি	

ছক পূরণ হয়ে গেলে আমরা দলে বসে আমাদের তৈরি করা ছকটি নিয়ে আলোচনা করি। আমরা আগের মতো পরস্পরের মিল ও অমিল খুঁজি। ছকটি আমরা যত্ন করে রেখে দিব। এই শিখন অভিজ্ঞতার পরবর্তী কাজের জন্য ছকটি প্রয়োজন হবে। এরপর আমরা আত্মপরিচয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানব।

একজন মানুষের আত্মপরিচয় গড়ে ওঠে তার পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে।

- ভৌগোলিক পরিচয়: সমভূমি, পাহাড়, হাওর অঞ্চল বা ব্যস্ত জনপদে বসবাসের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা
- রাজনৈতিক পরিচয়: জাতীয় বা নাগরিক/রাষ্ট্রীয় পরিচয়
- সাংস্কৃতিক পরিচয়: নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, পোশাক, ভাষা ইত্যাদি
- পারিবারিক পরিচয়: পারিবারিক কাঠামো (যৌথ বা একক), পরিবারে অবস্থানগত পরিচয়
- সামাজিক পরিচয়: পেশা বা জীবিকাধর্মী, সামাজিক অবস্থানভিত্তিক

এখন আমরা কয়েকজন মনীষীর আত্মপরিচয় সম্পর্কে জেনে নিই। তাঁদের পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিচয় খুঁজে বের করি।

পরিচয়: বাঙালি মনীষী

নোবেল বিজয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের কথা তোমরা জানো। তিনি বহুদিন যুক্তরাজ্যের কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। ওই দেশের বিশ্ববিদ্যালয় হলো অনেকগুলো কলেজের সমাহার। একসময় তিনি কেমব্রিজের সবচেয়ে খ্যাতিমান কলেজ ট্রিনিটির সর্বোচ্চ পদ 'মাস্টার অব ট্রিনিটি' ছিলেন। সেই সময়ে একবার বিদেশ থেকে ফিরে লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরের অভিবাসন বিভাগের কর্মকর্তার কাছে পাসপোর্টটা দিয়ে যখন দাঁড়ালেন, তখন সেই ভদ্রলোক তাঁর ঠিকানায় মাস্টার্স লজ (অর্থাৎ মাস্টারের বাড়ি), ট্রিনিটি দেখে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ট্রিনিটির মাস্টার কী তোমার বন্ধু?

একজন ভারতীয় তাঁদের দেশের সর্বোচ্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষ পদের অধিকারী হবেন এটা তিনি স্বপ্নেও চিন্তা করেননি।

অমর্ত্য সেন

ঢাকার সেন্ট গ্রেগরি স্কুল

শান্তি নিকেতনের পাঠ ভবন

ট্রিনিটি কলেজের আলোকচিত্র

তিনি একটি বইতে বিস্তর আলোচনার পর দেখিয়েছেন যে প্রতিটি মানুষের অনেক পরিচয় থাকে। যেমন : নিজের পরিচয় দাঁড় করাতে গিয়ে তিনি লিখেছেন একই সময়ে আমি একজন এশীয়, একজন ভারতীয় এবং একজন বাঙালি। একজন অর্থনীতিবিদ, যার দর্শনে আগ্রহ রয়েছে, একজন লেখক, সংস্কৃতজ্ঞ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের একজন একনিষ্ঠ অনুসারী, একজন পুরুষ যার সহানুভূতি রয়েছে নারীবাদের প্রতি, হিন্দু পারিবারিক ঐতিহ্যে বড়ো হলেও ব্যক্তিগত জীবনে আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে ভাবিত নন ইত্যাদি। হয়ত এই তালিকা আরও দীর্ঘ করা যায়।

অধ্যাপক অমর্ত্য সেনের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা জেনে নাও।

অমর্ত্য সেনের জন্ম ১৯৩৩ সালে শান্তিনিকেতনে। বাবা আশুতোষ সেন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের শিক্ষক। মা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অতি ঘনিষ্ঠজন শান্তিনিকেতনের প্রধান ব্যক্তিদের একজন, পন্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রীর কন্যা অমিতা সেন। ক্ষিতিমোহন ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক। প্রাচীন বৈদিক হিন্দু শাস্ত্র সম্পর্কে সুশিক্ষিত এবং মধ্যযুগের উত্তর ও পূর্ব ভারতে হিন্দি ও নানা দেহাতি ভাষায় যে মানবতাবাদী লোকধর্মের চর্চা হয়েছিল, তাঁর একজন অনুরাগী পাঠক ও গবেষক। তাঁর কথা একটু বেশি বললাম, কারণ ,অমর্ত্য সেনের মানস গঠনে তাঁর যথেষ্ট অবদান ছিল। পিতার সূত্রে তাঁর মা অমিতা সেন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা এবং রবীন্দ্রনৃত্যের প্রথম যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন। সেই সুবাদে তাঁর সন্তানের নামকরণ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অমর্ত্য সেনের পড়াশোনাশুরু হয়েছিল ঢাকায় সেন্ট গ্রেগরি স্কুলে। তারা থাকতেন তখনকার ঢাকার অভিজাত আবাসিক এলাকা ওয়ারীতে। পরে অমর্ত্য বাবা-মায়ের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে চলে আসেন এবং সেখানকার স্কুল পাঠভবনে ভর্তি হন। পরে সেখানকার কলেজ থেকে আইএসসি (এখনকার এইচএসসি) পাস করেন। এখানে তিনি অনেক বিশিষ্ট শিক্ষক, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, শিল্পীর সান্নিধ্যে আসেন। আর সেখানে ছিল অবারিত প্রকৃতি, সংগীত ও সংস্কৃতির এক প্রাণবন্ত পরিবেশ। এই পরিবেশ তাঁর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ তৈরি করেছে। আর তা মানুষটির বহুমাত্রিক পরিচয় তৈরির সহায়ক হয়েছে।

তারপর কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছেন অর্থনীতি নিয়ে। সেখানেও সহপাঠী এবং শিক্ষক উভয় দিক থেকেই তিনি ছিলেন সৌভাগ্যবান। নিজের কৃতিত্বে ও বাবার সহযোগিতায় পরে পড়তে যান ইংল্যান্ডে। সেখানে ক্যামব্রিজ থেকে গ্র্যাজুয়েশন ও পিএইচডি করেন। তারপরে দেশে ফিরে দিল্লি ও কলকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পড়িয়েছেন। একসময় ফিরে আসেন ইংল্যান্ডে। পরবর্তী দীর্ঘকাল ইংল্যান্ড, বিশেষত ক্যামব্রিজ ছিল তাঁর আবাস। প্রায় ১০ বছর তিনি আমেরিকার হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও দর্শন বিষয়ে অধ্যপনা করেন। তিনি দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, ক্ষমতা এবং সর্বোপরি কল্যাণ অর্থনীতি বিষয়ে গবেষণা করে যুগান্তকারী বই লিখেছেন। অর্থনীতিতে অবদানের জন্য তিনি ১৯৯৮ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। অর্থনীতির পাশাপাশি তিনি দর্শনও পড়িয়েছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার নোবেলজয়ী সাহিত্যিক নাদিন গার্ডিমার অধ্যাপক অমর্ত্য সেনকে আখ্যা দিয়েছেন 'বিশ্ব বুদ্ধিজীবী'। তাঁকে বিশ্ব বিবেকও আখ্যা দেওয়া যায়। তিনি যেমন আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দিয়েছেন, তেমনি স্বৈরতন্ত্র হটিয়ে গণতান্ত্রিক অভিযাত্রায়ও পাশে থেকেছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে অমর্ত্য সেন একাধিকবার বাংলাদেশে এসেছেন। বর্তমানে প্রায় ৯০ উর্ধ্ব বয়সেও পৃথিবী ও মানবতার যেকোনো সংকটে তাঁর বিবেকী কন্ঠস্বর শুনে আমরা আশ্বস্ত হই।

অমর্ত্য সেন তাঁর বইতে বলেছেন, মানুষ যখন তার বহু পরিচয় ভুলে কোনো একটি পরিচয়কে প্রকট করে তোলে, তা নিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে, তখন তার মধ্যে বিবেচনা কমে গিয়ে আবেগের প্রাবল্য দেখা দেয়, যুক্তির পরিবর্তে অন্ধ বিশ্বাস জন্মায়। আমরা জানি, অন্ধ রাগ থেকে আরও অনেক নেতিবাচক বোধের জন্ম হতে পারে। এতে সহানুভূতির পরিবর্তে ঘৃণার জন্ম হয়। এর ফলে শান্তি নষ্ট নয়। অনেক সময় দেখা যায়, ফুটবল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবের অন্ধ সমর্থকদের মধ্যে মারামারি লেগে যায়। সেই সময় মানুষগুলোর মনে কেবলমাত্র ক্লাবের প্রতি আনুগত্যই প্রাধান্য পায়। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর বাঙালি নিধনের উন্মত্ততায় আমরা হতবাক হয়ে যাই। তেমনি আবার ভরসা ফিরে পাই যখন দেখি, পৃথিবীর ভিন্ন ভাষী ভিন্ন ধর্মের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে আমাদের ন্যায্য লড়াইয়ের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ব্রিটিশ গায়ক জর্জ হ্যারিসন ও সেতারবাদক পন্ডিত রবিশংকর ১৯৭১ সালের আগস্টে নিউইয়র্কে আয়োজন করেছিলেন 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'। ফ্রান্সের লেখক ও পরে মন্ত্রী আঁদ্রে মালরো সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলন। আর আমাদের মুক্তিযুদ্ধে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান যেমন পাশাপাশি লড়াই করেছে, তেমনি জীবনও দিয়েছে একসঙ্গে। বোঝা যায় ,সব মানুষ কখনো একসঙ্গে তাঁদের বোধ বিবেচনা হারায় না।

অনুশীলনী ৪:

বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় অর্মত্য সেনের আত্মপরিচয় লিখি

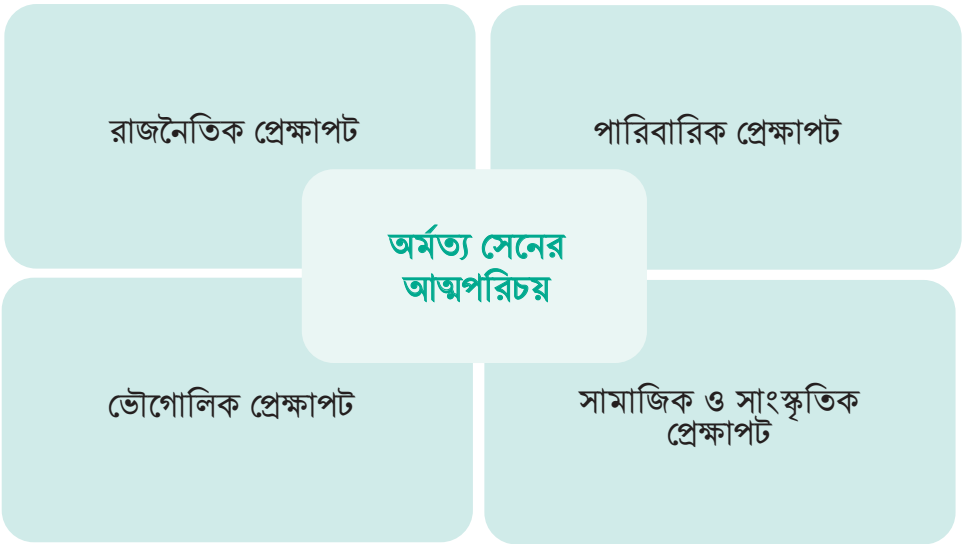

এতক্ষণ আমরা মোটামুটি সরলভাবেই আলোচনা করেছি। কিন্তু মানুষের জীবনে বহুরকম সম্পর্ক তৈরি হয় যা কিছু দলীয় বা সংঘবদ্ধ পরিচয় তৈরি করে। দেখবে অনেক সময় দেশ, জেলা বা শহরের নামে সমিতি হয়।

ভিন্ন দেশ, জেলা বা শহরে বসবাসকারী একই দেশ, জেলা বা শহরের মানুষজন নিজেদের আঞ্চলিক পরিচয়ে কোনো ভালো লক্ষ্য থেকেই সমিতি গড়ে তোলেন। আমরা তো জানি, মানুষ সামাজিক প্রাণী, সমাজ অর্থাৎ পরিচিত, সমমনা মানুষ ছাড়া তার ভালো লাগে না। মানুষ আজকাল বেশি গড়ে পেশাভিত্তিক সংগঠন। এভাবে পেশাভিত্তিক সমিতি যেমন আইনজীবী, প্রকৌশলী, চিকীৎসক, সাংবাদিক সবারই এরকম একক পেশাগত পরিচয়ে সংগঠন থাকে। এগুলো পেশাগত কাজে যেমন ভূমিকা রাখে, তেমনি মানবিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করে। অনেকে ক্লাব গঠন করে খেলাধুলা, নাটক চর্চা ও অন্যান্য বিনোদনমূলক কাজও করেন। আবার দেখা যায় চাকরিতে অবসরপ্রাপ্ত মানুষও সংঘবদ্ধ হন, মূল উদ্দেশ্য অবসর জীবনে নিরাপদ, ভালো ও আনন্দে থাকা। সমিতি সে লক্ষ্যে আয়োজন করে থাকে। ইদানীং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্ররাও নানা সংগঠন তৈরি করে পুনর্মিলনীর আয়োজন করে। এর মধ্যেও মানুষের সামাজিকতার প্রমাণ মেলে।

কমরেড মণি সিংহ (১৯০১-১৯৯০)

ইলা মিত্র (১৯২৫- ২০০২)

পরিস্থিতি এবং নিজের বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে আমরা অনেক সময় নিজেদের কোনো একটি পরিচয়কেই গুরুত্ব দিয়ে থাকি বা নতুন একটি পরিচয় গ্রহণ করি, যেমন মণি সিংহ ও ইলা মিত্র নিয়েছেন। একইভাবে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় একদিকে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ যেমন বাঙালি পরিচয় থেকে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছে, অন্যদিকে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীও আমাদের বাঙালি পরিচয়কে গুরুত্ব দিয়ে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় বাঙালিদের মধ্যে গায়ক শহিদ আলতাফ মাহমুদ, চিত্রকর- যেমন, শিল্পী মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দীন আহমেদ, চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হান, আমলা তৌফিক-ই-এলাহী চৌধুরী বীর বিক্রম প্রমুখ বিভিন্ন অঙ্গনের মানুষ তাঁদের বিচিত্র আগ্রহ ও পরিচয়কে বাদ দিয়ে কেবল বাঙালি পরিচয়কেই একমাত্র বড়ো করে দেখেছিলেন। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন, কেউ কেউ শহিদ হয়েছেন। আর পাকিস্তানিরাও আমাদের বৈচিত্র্যময় পরিচয়গুলো ভুলে কেবলমাত্র বাঙালি হিসাবে গণ্য করে হত্যার লক্ষ্যে আক্রমণ চালিয়েছিল। সেদিন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাঙালির এমন এমন জাগরণ ঘটেছিল, এমন ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে, বহু মানুষ তাঁদের এতদিনের রাজনৈতিক আনুগত্য বা পছন্দের দলের অবস্থান কী তা ভাবনা থেকে বাদ দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে শামিল হয়েছিলেন। বলা যায়, এ ছিল জাতি হিসাবে এদেশের বাঙালির কাছে ইতিহাসের বিশেষ সন্ধিক্ষণের চাহিদা।

শহিদ আলতাফ মাহমুদ (১৯৩৩-১৯৭১)

চলচ্চিত্র নির্মাতা জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২)

চিত্রকর শিল্পী মুক্তিযোদ্ধা শাহাবুদ্দিন (১৯৫০-)

সেদিন এ চাহিদার ন্যায্যতা এত স্পষ্ট ছিল যে এদেশে বসবাসকারী অন্যান্য ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর মানুষও মুক্তিযুদ্ধে যুক্ত হতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তেমনি বিভিন্ন সময়ে হিন্দু-মুসলমানে স্বার্থের সংঘাত হলেও সেদিন মানুষ ধর্মীয় পরিচয়ের দূরত্ব ভুলে গিয়ে ভাষা-জাতি পরিচয়ে এক হয়েছিল। আর এ অভাবিত ঘটনা ঘটেছিল মূলত বঙ্গবন্ধুর জাদুকরি নেতৃত্বের গুণে। এবং এ কারণেই তিনি ইতিহাসের মহানায়ক।

তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, আমাদের একেকজনের অনেক পরিচয় থাকে কেবল এটুকু বললে বিষয়টা পরিষ্কার বোঝা যায় না। পরিস্থিতি ও বাস্তবতার আলোকে অনেক রকম বিকল্প পরিচয়, এমনকী কখনো একক পরিচয়ও প্রাধান্য পায়। তখন অন্য পরিচয়গুলো সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে হয়। অমর্ত্য সেন তাই পরিচয় পছন্দের ক্ষেত্রে যুক্তি ও বিবেচনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ আমরা যেন যুক্তি ও বিবেচনা প্রয়োগ করেই নিজেদের বৈচিত্র্য ও একত্বের বিষয়গুলো নির্বাচন করি।

আমরা হয়তো অনেকেই জানি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক একজন ভারতীয়। বাংলাদেশের মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিকী যুক্তরাজ্যের বিরোধী দলীয় এমপি। তিনি বঙ্গবন্ধুর নাতনি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগনি, তাঁর ছোটোবোন শেখ রেহানার কন্যা।

আমাদের মধ্যেও ভবিষ্যতে কেউ কেউ এভাবে অন্য দেশের বিশিষ্ট মানুষ হবে।

আসলে খোঁজ নিলে দেখব, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এরকম ভিন্ন দেশের মানুষজন অনেক বড়ো বড়ো পদে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। ধরো, বিশ্বের একসময়ের সর্বোচ্চ ভবন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরের সিয়ার্স টাওয়ারের নকশা করেছেন বাংলাদেশি প্রকৌশলী ফজলুর রহমান খান। তাঁকে বলা হয় আকাশচুম্বি বহুতল ভবনের প্রকৌশলের জনক। ফজলুর রহমান খানের জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার একটি ছোট শহরে। তিনি বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে উচ্চতর পর্যায়ের অধ্যয়নের জন্য আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন। পরে সেখানে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ নির্মাণ সংস্থায় কাজ করার সূত্রে আকাশচুম্বি ভবনের নির্মাণকৌশল আবিষ্কার করেন। এই আবিষ্কারের বিশেষত্ব হলো, এর মাধ্যমে অতিরিক্ত উঁচু ভবন নির্মাণে বাতাসের গতি ও ভূকম্পনের সম্ভাব্য ক্ষতি প্রতিরোধ। প্রকৌশলী খানের উদ্ভাবিত টিউবপদ্ধতি পরবর্তীকালে সুউচ্চ ভবন নির্মাণে সবাই ব্যবহার করছেন। স্থাপত্য ও কাঠামো-প্রকৌশলে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের এই মানুষটি একজন কীংবদন্তি বিশেষ। পরপর ছয় বছর তিনি আমেরিকার সেরা স্থপতির রাষ্ট্রীয় সম্মান পেয়েছেন। সর্বশেষ এই সম্মানের সাল ১৯৭১ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বছর। ফজলুর রহমান খান তাঁর কতিপয় আমেরিকান বন্ধু এবং আমেরিকায় বসবাসকারী বাঙালিদের সহায়তায় মুক্তযুদ্ধে সহায়তার জন্য ওয়েলফেয়ার আপিল ফান্ড এবং বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ গঠন করেন। প্রবাসে থেকে এবং একজন আমেরিকান হয়েও তিনি প্রকৃত বাঙালি ছিলেন, নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখেন।

সিয়ার্স টাওয়ার ও প্রকৌশলী ড. ফজলুর রহমান খান (১৯২৯-১৯৮২)

তখনকার অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার থেকে সারা বিশ্বের পাকিস্তানি দূতাবাসে কর্মরত বাঙালিদের চাকরি ছেড়ে দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছিল। তিনি ওইসব বাঙালিদের চাকরি ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করেন এবং অর্থনৈতিক সহায়তার ব্যবস্থা করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে তিনি বাংলাদেশে এসেছিলেন। ১৯৮৩ সালের ২৭ মার্চ ফজলুর রহমান খান মাত্র ৫৩ বছর বয়সে হৃদরোগের আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ১৯৯৯ সালে ফজলুর রহমান খানকে স্বাধীনতার পদক (মরনোত্তর) প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত করা হয়। ভেবে দেখো, কোনো দেশের মানুষ কোথায় গিয়ে কীভাবে খ্যাতিমান হচ্ছেন, এমনকী বিশ্বব্যাপী পরিচিতি পাচ্ছেন।

অনুশীলনী ৫: বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় প্রকৌশলী ড. ফজলুর রহমান খানের আত্মপরিচয় লিখি

ফজলুর রহমান খানের আত্মপরিচয়

- রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
- পারিবারিক প্রেক্ষাপট
- ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট
- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

আমরা এখন বুঝতে পারছি একজন মানুষ একাধিক দেশের পরিচয় বহন করতে পারেন। মানুষের চলাচল শুরু হয়েছে অনেক আগেই। আদি মানুষের উৎপত্তি হয়েছে প্রধানত আফ্রিকায়। সেখান থেকে তাঁদের কিছু কিছু মানুষ বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেটা ছিল আদিকালের অভিবাসন। অভিবাসন এখনও আছে, তবে পদ্ধতি-প্রক্রিয়া পরিবর্তিত হয়েছে।

জাতীয় পরিচয়

অষ্টম শ্রেণির তারেকের মামা পনেরো বছর আগে উচ্চমানের শিক্ষার জন্য কানাডায় গিয়েছিলেন। পড়াশোনা শেষ করে সেখানে ভালো চাকরি পেয়ে যান। সেখানেই বিয়ে করে সংসার পাতেন তারপর থেকে তিনি ওখানেই থাকেন। মাঝে মাঝে পুরো পরিবার নিয়ে বাংলাদেশে বেড়াঁতে আসেন। তারা সবাই কানাডার নাগরিক। বাঙালি হয়েও তারা কানাডিয়ান হিসাবে পরিচয় দিতে পারেন। অবশ্য মামা ও মামি এখনো রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে বাংলাদেশের নাগরিক, একই সঙ্গে কানাডারও নাগরিক। তাঁদের ছেলে মেয়েরা কানাডায় জন্ম নিয়ে কানাডার নাগরিক পরিচয় বহন করছে, তারা বাংলাদেশের নাগরিক নয়।

তাঁদের সন্তানেরা কানাডার নাগরিক হলেও নিজেদের বাঙালি হিসাবে পরিচয় দেয়। কারণ, তারা মা-বাবার কারণে বাঙালি সংস্কৃতি ধারণ করে, বাংলায় কথা বলে, খাদ্য-পোশাক, আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি আমাদের দেশের আর সবার মতোই। অর্থাৎ তাঁদের নাগরিক পরিচয় কানাডিয়ান হলেও তারা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে বাঙালি। কানাডায় ওদের পরিচয়ে ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠী বলা হয়ে থাকে। কোনো কোনো দেশে অভিবাসন আইন অনুসারে স্থায়ীভাবে বাস করতে হলে জন্মস্থানের দেশের নাগরিকত্ব ছেড়ে দিতে হয়, তবে তারা নৃতাত্ত্বিক জাতিগত পরিচয়ে বাঙালি। তারা ইচ্ছা করলে নাগরিক পরিচয়ে বাংলাদেশি হতে পারে, সেক্ষেত্রে কানাডায় তাঁদের নাগরিক পরিচয় হবে প্রবাসী হিসাবে।

নাগরিকের ধারণা

একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনসমষ্টি সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হয়। নগর বা সিটি থেকে নাগরিক শব্দের উৎপত্তি হয়েছে, প্রাচীনকালে নগরে বসবাসরত অধিবাসীদের নাগরিক বলা হতো। মানব সমাজ মূলত নগরায়ণের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। ধীরে ধীরে নগর রাষ্ট্রের জায়গায় জাতীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটেছে। সামাজিক বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তির বিকাশ ও উন্নততর যোগাযোগ বৃহত্তর জনগোষ্ঠী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে একত্র হয়েছে। একজন নাগরিক তার রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে রাষ্ট্র-প্রদত্ত রাজনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা ভোগ করার অধিকার অর্জন করে।

অর্থাৎ, নাগরিক হচ্ছেন তিনি, যিনি ওই রাষ্ট্রে বসবাস করেন এবং রাষ্ট্রের আইন, সংবিধান ও অন্যান্য নির্দেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন । তবে একজন ব্যক্তি বসবাস না করেও কোনো রাষ্ট্রের আইন ও সংবিধানে অনুগত থেকে অন্য দেশে প্রবাসী হিসেবে বাস করতে পারেন কিংবা একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারেন। একজন নাগরিক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সকল সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করবেন এবং রাষ্ট্রের কল্যাণ সাধনে নিজের কর্মের মাধ্যমে ভূমিকা রাখবেন । রাষ্ট্র নারী-পুরুষ, ধর্ম, গোত্র, নির্বিশেষে নাগরিক হিসেবে সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করে।

চলো এখন আমরা বাংলাদেশের নাগরিকের জাতীয় পরিচয় পত্রের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে জানি। আমরা পরিবারের প্রাপ্ত বয়স্ক কারো কাছ থেকে একটি জাতীয় পরিচয় পত্র নিয়ে নিচের ছবিটির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি। আমাদের যখন বয়স ১৮ বছর হবে আমরাও এরকম একটি জাতীয় পরিচয় পত্র পাওয়ার জন্য রাষ্ট্রের কাছে আবেদন করতে পারব।

জাতীয় পরিচয়পত্রের সামনের দিক

জাতীয় পরিচয়পত্রের পিছন দিক

বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয় পত্রে একজন নাগরিকের বিভিন্ন তথ্য দেওয়া থাকে। এই তথ্যের ভিত্তিতে নাগরিক তার রাষ্ট্রীয় পরিচয় বহন করে। এভাবে শিক্ষার্থী হিসাবে আমাদের বিদ্যালয়ে একটি পরিচয় রয়েছে। চলো আমরা আমাদের শিক্ষার্থী পরিচয়কে খুঁজি। এজন্য নিচের তথ্যগুলো পূরণ করি।

অনুশীলনী ৬:

শিক্ষার্থীর পরিচয়	
শিক্ষার্থীরা নাম:	
শিক্ষার্থীর ইউনিক আইডি নং:	
লিঙ্গ:	
শ্রেণি:	
বয়স:	
পিতার নাম:	
মাতার নাম:	
ঠিকানা:	
বিদ্যালয়ের নাম:	

আমাদের রাষ্ট্রীয় পরিচয় আমরা বাংলাদেশি, অর্থাৎ আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। রাষ্ট্রীয় পরিচয়কে জাতীয়তা বা ন্যাশনালিটি বলা হয়। সেই অর্থে আমরা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক (সাংস্কৃতিক, ক্ষেত্রবিশেষে জাতি বা বর্ণভিত্তিক) পরিচয়ে একটি দেশের মানুষের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য থাকতে পারে। সেদিক থেকে বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী বাঙালি আর সঙ্গে আছে আরও অনেক জাতিগোষ্ঠী। অর্থাৎ আমাদের পরিচয় যখন সংস্কৃতিভিত্তিক বা নৃতাত্ত্বিক, তখন আমরা বাঙালি অথবা চাকমা, সাঁওতাল, মান্দি বা গারো, হাজং, খাসিয়া, রাখাইন ইত্যাদি। আমাদের দেশের নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে অবাঙালি এসবজনগোষ্ঠীকে এক কথায় ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠী বলা হয়। কোনো কোনো দেশে বা ক্ষেত্রবিশেষে সেই দেশের জনসংখ্যার মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির তুলনায় অনেক কম কিন্তু ভিন্ন সংস্কৃতির এই জনগোষ্ঠীকে ইংরেজিতে ইথনিসিটি বলে। আমাদের দেশে এই ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীদের আগে উপজাতি বা আদিবাসী বলা হতো। একটু ভিন্নতর এই জাতিগোষ্ঠীগুলোকে 'উপ' বলা যায় না, কারণ তাঁরা সংখ্যায় কম হতে পারে, কিন্তু তাঁদেরও রয়েছে স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। অন্যদিকে কোনো নৃগোষ্ঠী নানা সময়ে নানা দিক থেকে এসে এই অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছে, এদের মধ্যে কারা সবার আগে থেকে বাস করা শুরু করেছে, তা সুনির্দিষ্ট করে জাতিগত বিভাজন রেখা টানা অর্থহীন। সেই অর্থে আমরা নির্দিষ্ট কোনো জাতিগোষ্ঠীকে আদিবাসী বলতে পারিনা। বাংলাদেশে বসবাসকারী ক্ষুদ্রনৃগোষ্ঠীর এই মানুষজন বাঙালি না হয়েও বাংলাদেশি জাতীয় (ন্যাশনালিটি) পরিচয়ের দিক থেকে স্বজাতি।

অন্য-নৃগোষ্ঠী ও বাঙালি নরনারী

নানা কারণে মানুষ মাতৃভূমি ছেড়ে অন্য দেশে গিয়ে থাকতে পারে। কিছুকাল থেকে ফিরে আসে কেউ কেউ, আবার অনেকে স্থায়ীভাবে থেকে যায়। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এমনভাবে প্রবাসজীবন বেছে নিয়েছে। কেউ বাস করছে প্রবাসী হয়ে, কেউ ওই দেশের অভিবাসন আইন মেনে নাগরিকত্ব পরিবর্তন করে বাস করে। অনেক বাঙালি কয়েক প্রজন্ম ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাস করছে। ২০১৯ সালের বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাব অনুসারে এক কোটির অধিক সংখ্যক বাংলাদেশি নাগরিক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রবাসী হিসাবে বসবাস করছে।

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চলতে বসবাসের জন্য উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বেড়িয়েছে। এখন থেকে প্রায় ষাট হাজার বছর আগে মানুষ অভিবাসনের জন্য সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করেছিল। ভালোভাবে বাঁচার প্রচেষ্টা থেকে মানুষ সৃষ্টির আদিকালে যেমন জন্মস্থান বা মাতৃভূমি পরিবর্তন করেছে, এখনও তাই করছে। কয়েক শতাব্দি থেকে হাজার বছর বসবাসের ফলে সেই দেশের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ ও স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাবে চলমান পরিবর্তনে নতুন মাত্রা যোগ হয়। ফলে তাঁদের পরিচয়ে নতুন মাত্রা যোগ হয়। অন্যদিকে দেশান্তরী হয়ে মানুষ নিজের জীবনযাপন প্রণলীসহ তার ভাষা, ধর্ম, বিশ্বাস সঙ্গে নিয়ে সেখানেও ছড়িয়ে দেয়। ওখানকার মানুষজনও সেইসব সাংস্কৃতিক উপাদান ধীরে ধীরে গ্রহণ করেছে। এভাবে মানুষের পরিচয়ে বিশেষ করে জাতিগত পরিচয়ে নানা বৈচিত্র্য সৃষ্ট হয়েছে।

তোমরা আরবের বেদুইন বা উত্তর মেরুর এস্কীমোদের জীবনের তুলনা করলে দেখবে, আঞ্চলিক ভৌগোলিক পরিবেশ কীভাবে একজন মানুষের জীবনধারাকে প্রভাবিত করে ও বিশিষ্ট করে তোলে। সংক্ষেপে তাঁদের পরিচয় দেওয়া হলো।

ভৌগোলিক পরিচয়

বেদুইন: আরব উপদ্বীপে প্রাচীনকাল থেকে বসবাসকারী জাতি। এরা স্বাধীনচেতা যাযাবর শ্রেণির মানুষ। এরাই আরবের আদিম আদিবাসী। এরা সাধারণত তাঁবুতে বাস করে, উট, ভেড়া, দুম্বা পালন করে, ঘোড়ায় চড়ে চলাচল করে। তাঁদের জীবন সরল ও সাদাসিধে ধরনের। মূলত পশুপালনই তাঁদের পেশা। তারা ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তবে আজকাল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এদের জীবনেও অনেক পরিবর্তন আসছে। তারা মরুভূমিতে থাকে বলে চাষবাস করার সুযোগ পায় না। মরুদ্যান হলো তাঁদের প্রাকৃতিক মনোরম স্থান। তবে তারা কঠিন এবং সবল জীবনেই অভ্যস্ত।

এস্কীমো : উত্তর মেরুর তুষারাবৃত অঞ্চলের বাসিন্দা। এদের চেহারায় মঙ্গোলীয় ধাঁচ রয়েছে বলে ধারণা করা হয় এরা এশিয়া মহাদেশ থেকে প্রাচীনকালে এ অঞ্চলে এসেছিল। এরকম কঠিন প্রাকৃতিক পরিবেশে পৃথিবীর কম মানুষই বসবাস করে থাকে। রেড ইন্ডিয়ান ভাষায় এস্কীমো শব্দের অর্থই হলো কাঁচা মাংস ভক্ষণকারী। তারা তীর, বল্লম ও ফাঁদ ব্যবহার করে কয়েক ধরনের মাছ, সিল ও অন্যান্য মেরুপ্রাণী শিকার করে। এসব প্রাণী থেকেই তারা খাদ্য, বস্ত্র (চামড়া) আলো, তেল, হাতিয়ার সংগ্রহ ও তৈরি করে নেয়। তারা পরিবহন ও যাতায়াতে চামড়ার তৈরি নৌকা 'কায়াক' এবং কুকুরে টানা স্লেজ গাড়ি ব্যবহার করে। মাছ ও বল্গা হরিণ তাঁদের অর্থনীতিতে বড়ো ভূমিকা পালন করে। তারা সাধারণত ছোটো ছোটো দলে বাস করে। নিজস্ব পুরাণের ভিত্তিতে তারা ধর্ম ও আচার পালন করে। গ্রীষ্মে তারা তাঁবুতে ও শীতে বরফের তৈরি ইগলুতে বাস করে। মনে রেখো, ওদের দেশে ছয় মাস রাত আর ছয় মাস দিন।

সাংস্কৃতিক পরিচয়

খেয়াল করলে দেখবে, ভাষায় নতুন নতুন শব্দের প্রবেশ কিন্তু থেমে নেই। তেমনি পোশাক খাদ্য, সংগীত, শিল্পকলা সব ক্ষেত্রেই দেওয়া-নেওয়া চলছে। বলা হয় সংস্কৃতিতে গ্রহণ-বর্জন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটু লক্ষ্য করলে দেখবে আমরা আজকাল দৈনন্দিন কথাবার্তায় ইংরেজি শব্দের ব্যবহার অনেক বেশি করছি। অনেক আগেই টেবিল, চেয়ার, পিন, ফ্যান, ফ্রিজ, অ্যালার্ম, পুলিশ ইত্যাদি শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হচ্ছে। ইদানীং মাউজ, ক্লিক, ফেইসবুক, টুইটার ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার ছাড়া চলছেই না। অন্যান্য ক্ষেত্রেও এরকম পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। তা বলে নিজেদের ভাষা সংস্কৃতি ঐতিহ্য ভুলে গেলেও চলবে না। ঐ যে বলা হয়েছে গ্রহণ-বর্জন সে কথাটা মনে রাখবে।

ভাবো একবার, এইভাবে নিতে নিতে আর ছাড়তে ছাড়তে মানুষের জীবনে কত পরিবর্তন ঘটে যায়। আর এইভাবেই কেউ হয়ে ওঠেন একজন অর্মত্য সেন, কেউবা হয়ে ওঠেন সত্যজিৎ রায়, কেউ জয়নুল আবেদীন, কেউ জসীম উদ্দীন। তোমরা সপ্তম শ্রেণির ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে গ্রামের নদী-খাল-কাদা আর কৃষি ক্ষেতের মধ্য থেকে ওঠে আসা বালক মুজিবের বঙ্গবন্ধু, এমনকী বিশ্ববন্ধু হয়ে ওঠার কাহিনি পড়ে নিও।

পারিবারিক পরিচয়

অষ্টম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থীর নাম কাজী ফরিদ, যার বাবার নাম কাজী বশির উদ্দিন; একজনের নাম শান্তা সাহা এবং তার বাবার নাম নন্দলাল সাহা। আবার এখানেই একজন আছে লিরা দ্রোফো এবং তার মায়ের নাম দিপালী দ্রোফো। মানুষের নামে দুই তিনটি শব্দ থাকে। একটি হলো তার একেবারেই নিজস্ব নাম, দুটি নামও নিজস্ব হতে পারে, আর একটি শব্দ তার পারিবারিক পরিচয় বহন করে। পারিবারিক পরিচয়ের শব্দটি বাবার বা কোনো সময় বাবা ও মা উভয়ের নামের সঙ্গেও থাকে। মাঝে মাঝে কেবল মায়ের পরিচয়ের শব্দ থেকে নেওয়া হয়। পারিবারিক পরিচয়ে একটি বিশেষ শব্দের ব্যবহার বেশ প্রাচীনকাল থেকেই নানা দেশে নানাভাবে প্রচলিত। আমাদের সমাজে পাবিবারিক পরিচয় বহনকারী শব্দের কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

দলগত কাজ ২:

আমরা এই শিখন অভিজ্ঞায় দলগত কাজ ১ এবং অনুশীলনী ৩ এর আমার পারিবারিক পরিচয়ের ছক থেকে তথ্য নিয়ে নিজেদের পরিচয় সম্পর্কে লিখি। আমরা পারিবারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিজেদের আত্মপরিচয় লিখব। খেয়াল করলে দেখব এই দুটি ছক থেকে আমরা প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে যাচ্ছি। প্রয়োজনে আমরা দলের অন্যান্য সদস্য বা শিক্ষকের কাছ থেকে সহায়তা নিয়ে নিচের ছকটি পূরণ করতে পারি।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

পারিবারিক প্রেক্ষাপট

ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট

বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আমার পরিচয়

কাজটি শেষ হয়ে গেলে আমরা প্রতিদল থেকে নতুন ১-২ জন বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নিজেদের পরিচয়কে উপস্থাপন করব। আমরা বন্ধুদের উপস্থাপনা শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি আত্মপরিচয় গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে

আমাদের কিছু প্রেক্ষাপটের মিল রয়েছে। আবার কিছু প্রেক্ষাপটের অমিল রয়েছে। এভাবেই আমাদের পরিচয় হয়ে ওঠে বৈচিত্র্যময় ও অনন্য।

আমরা বিভিন্ন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আত্মপরিচয় গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানলাম। আমাদের সবার আত্ম পরিচয় বৈচিত্র্যময় ও অনন্য। আমরা অনেক সময় খেয়াল করলে দেখব, আমাদের পরিচয়ের ভিন্নতা অনেকেই পছন্দ করছে না। অনেক সময় কোনো একটি নির্দিষ্ট পরিবার, এলাকার, ভাষার বা গোত্রের মানুষ হবার কারণে মানুষ বিভিন্ন রকম চ্যালেঞ্জ বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। অনেকেই বাজে মন্তব্য করে ফেলে। আবার অনেকে খারাপ ব্যবহার করে। কিন্তু প্রতিটি মানুষের আত্মপরিচয়ই হচ্ছে তার গর্ব। আত্মপরিচয়ের ভিন্নতার মধ্যই রয়েছে সৌন্দর্য। চলো এখন আমরা দলগতভাবে একটি কাজ করি।

দলগত কাজ ৩:

দলে আলোচনা করে ঠিক করি সমাজের মানুষ আত্মপরিচয়ের অনন্যতা ও বৈচিত্র্য ধরে রাখতে হলে কী কী চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে থাকে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমরা কী কী নীতিমালা অনুসরণ করতে পারি।

মানুষের আত্মপরিচয় ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ

আত্মপরিচয় ধরে রাখার জন্য আমাদের করণীয় নীতিমালা

আমরা প্রতি দল থেকে ১-২ জন দলীয়ভাবে নির্ধারিত এই নীতিমালা উপস্থাপন করব। এরপর বন্ধুদের সবার সঙ্গে মত বিনিময় করে বিদ্যালয়/পরিবার/সমাজে পালনীয় কিছু নীতিমালা ঠিক করে পোস্টার পেপারে বা কাগজে লিখব। নীতিমালাগুলো 'ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি' শীর্ষক শিরোনামে শ্রেণিকক্ষে টানিয়ে রাখব। এই নীতিমালাগুলো আমরা সারাবছর ব্যাপী অনুসরণ করব।